ছেলে এসে সেই দুঃখে মায়ের কোলে লুটিয়ে পড়ল। বললে, "মা, বাবা আমাকে যেন চিনতেই পারলেন না।" মাও চোখের জল রাখতে পারলেন না। ছেলে তখন বললে, "মা, আমার শিক্ষার তবে কী উপায় হবে।" মা বললেন, "তোমার বাপই যখন তোমাকে উপেক্ষা করলেন তখন আর কার কাছে যাব। আচ্ছা, আমি তো শূদ্র-কন্যা অর্থাৎ পৃথিবীর সন্তান (child of the soil), আমার মা পৃথিবীকে ডেকে দেখি।" এই বলে তিনি পৃথিবীকে ডাকলেন।

মাতা বসুন্ধরা এসে বললেন, "ভয় নেই, সব জ্ঞানই তো আমার মধ্যে নিহিত, এই ছেলেকে দাও আমার হাতে, আমি একে শিক্ষা দেব।" পৃথিবীমাতা ছেলেকে সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত করে মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলেন। তখন সেই ছেলে তাঁর বাল্যকালের অপমানের শোধ তুললেন। তিনি ঋগ্বেদের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগ্রন্থ লিখলেন। আজ যিনি যত বড়ো বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণই হোন না কেন, সেই ব্রাহ্মণগ্রন্থখানি না পড়লে ঋগ্বেদের মধ্যে প্রবেশ করাই অসম্ভব। তারপর তিনি নিজে যে শূদ্রার অর্থাৎ ইতরার ছেলে এইটে খুব ভালো করে বুঝিয়ে দেবার জন্য তিনি নিজেকে ইতরার পুত্র 'ঐতরেয়' নামে খ্যাত করলেন তাই সেই ব্রাহ্মণের নাম হল ঐতরেয় ব্রাহ্মণ। এই শূদ্রা মায়ের ছেলের আসল নামটি ঐ ঐতরেয় নামের তলে চাপা পড়ে আছে। মহীর শিষ্য বলে তাঁকে মহীদাসও বলে। তাই ঐতরেয় মহীদাসই তাঁর পরিচয়। এই ঋষির সব কথা 'ঐতরেয়ালোচনম্' নামে গ্রন্থে স্বর্গীয় সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় লিখেছেন।

ঋগ্বেদ জানতে হলেই যে ঐতরেয়ব্রাহ্মণের প্রয়োজন শুধু এই কথা বললে খুব অল্প বলা হবে। বড়ো বড়ো চিরন্তন সত্য ঐ গ্রন্থে এমনভাবে দেওয়া হয়েছে যে, এখনও তা দেখলে বিস্মিত হতে হয়। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক, এগিয়ে চলাই এখনকার ধর্ম। আমরা মনে করি পুরোনো যুগে স্থিতিশীলতাই ছিল ধর্ম। কিন্তু ঐতরেয়ব্রাহ্মণে (৭, ১৫, ১-৫) একটি গল্পে রোহিতকে যে উপদেশ দেবতা দিচ্ছেন তার চেয়ে গতিশীল ধর্মের উপদেশ কোথাও শুনিনি। রাজপুত্র রোহিত দীর্ঘকাল চলে চলে শ্রান্ত হয়ে বিশ্রামের জন্য যখন ঘরের দিকে চলেছেন তখন পথে তাঁকে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্র পর-পর পাঁচবার বললেন—

নানা শ্রাণ্তায় শ্রীরস্তি ইতি রোহিত শুশ্রুম।
পাপো নৃষদ্ বরো জনঃ ইন্দ্র ইচ্চরতঃ সখা। চরৈবেতি, চরৈবেতি।

আর্য ও অনার্য সংস্কৃতির মিলন

মোহেঞ্জোদরো হরপ্পা প্রভৃতিতে যে সভ্যতার পরিচয় মেলে সে সভ্যতা খুবই উঁচুদরের। কাজেই অতিপ্রাচীন যুগেও ভারতের সভ্যতা যে কত উন্নত ছিল তা বেশ বোঝা যায়। বৈদিক আর্যেরা যে তাঁদের পরাজিত করলেন তার কারণ বেদপূর্ব ভারতে লোহা ও ঘোড়া ছিল না। মোহোঞ্জোদরোতে আর সব পেলেও লোহা ও ঘোড়া পাওয়া যায়নি। বৈদিকেরা লোহা ও ঘোড়া ব্যবহারে দক্ষ ছিলেন। তাছাড়া সংহত একদল আক্রমণকারীর কাছে, যতই সভ্য হোক গৃহস্থের দল পেরে ওঠে না। তাই মোগলেরা ও তুর্কিরা এত সহজে বড়ো বড়ো সব সভ্যতাকে জয় করতে পেরেছেন।

বৈদিক সভ্যতা ভারতে এসে যাগযজ্ঞময় কর্মকাণ্ড নিয়ে তার যে সংস্কৃতিটি প্রতিষ্ঠিত করেছিল তার মূল স্থান হল যজ্ঞবেদী। যজ্ঞবেদীরই চারদিকে বৈদিক সংস্কৃতির শিক্ষায়তনটি ক্রমে গড়ে উঠল। আর বেদবাহ্য যে অপূর্ব সভ্যতা ভারতে ছিল, তীর্থগুলিকে আশ্রয় করে অগ্রসর হওয়ায় 'তৈথিক' বলে তা

শিল্প সম্বন্ধেও ঐতরেয়ের বাণীগুলি অপূর্ব। ঐতরেয় বলেন, শিল্পীরা তাঁদের শিল্প-সৃষ্টির দ্বারাই দেবতার স্তব করছেন। সৃষ্টিতে যে দেবশিল্প তারই অনুপ্রেরণায় শিল্পীদের যে এই সব শিল্প, তাই বুঝতে হবে। যিনি এই ভাবে শিল্পকে দেখেছেন তিনিই শিল্পের মর্ম বুঝতে পেরেছেন। শিল্পের দ্বারাই শিল্পীর যে উপাসনা, তাতে স্বর্গ বা মুক্তি মেলে না। তার ফল হল শিল্পের দ্বারা আপনার আত্মাকে সংস্কৃত করে তোলা। শিল্পসাধনার দ্বারা বিশ্বের দেবশিল্পের ছন্দে শিল্পী আপনাকে ছন্দোময় করে তোলেন।

ওঁ শিল্পানি শংসতি দেবশিল্পানি। এতেষাং বৈ শিল্পানাম্ অনুকৃতীহ শিল্পম্ অধিগম্যতে…। শিল্পং হাস্মিন্নধিগম্যতে য এবং বেদ যদেব শিল্পানীঁ। আত্মসংস্কৃতি বাব শিল্পানি ছন্দোময়ং বা এতৈর্যজমান আত্মানং সংস্কুরুতে।—ঐ ব্রা ৬, ৫, ১

শিল্প সম্বন্ধেও এর চেয়ে বড়ো কথা আর শোনা যেতে পারে না। এই সব মহা মহাবাণী উচ্চারণ করে গেছেন যে মহর্ষি সেই ঐতরেয় ছিলেন আর্য ও অনার্য সংস্কৃতির একটি অপরূপ ও মহনীয় সমন্বয়। ঐতরেয় বলেন, অনার্যেরা পৃথিবীর সন্তান। ইতরা তাই মাতা পৃথিবীকে শরণ করেছিলেন। আর্য-অনার্য মিলনে তাই যে সব বিদ্যার সম্ভাবনা হল, তার সঙ্গে পৃথিবীর ঘনিষ্ঠ যোগ যে আছে, তা এই চৌষট্টি কলার তালিকা দেখলেই বোঝা যায়।

৬৪টি কলার নাম—(১) নৃত্য, (২) গীত, (৩) বাদ্য, (৪) উদক বাদ্য, (৫) নাট্য, (৬) সাজসজ্জা ও কুরূপকে সুরূপ করবার বিদ্যা বা কৌচুমার যোগ, (৭) নেপথ্য বা বেশ-রচনা, (৮) বিশেষকচ্ছেদ্য বা তিলকাদি রচনা, (৯) দশন-বসন-রঞ্জন, (১০) কেশে পুষ্পবিন্যাস, (১১) কেশবিন্যাস, (১২) পুষ্পাস্তরণ, (১৩) মাল্যরচনার বিদ্যা, (১৪) গন্ধযুক্তি, সুগন্ধপ্রস্তুত বিদ্যা, (১৫) আলেখ্য, বর্ণকরণ ও চিত্রকরণ, (১৬) প্রতিকৃতি নির্মাণ, (১৭) যুদ্ধবিজয় বিদ্যা, (১৮) বৃক্ষায়ুর্বেদ, (১৯) নানাবিধ পাকবিদ্যা, (২০) পানীয় রচনা, (২১) তক্ষণ বা ছুতরের বিদ্যা, (২২) চরখা কাটা, (২৩) বেত ও তৃণাদির দ্বারা ডালা কুলো প্রভৃতি রচনা, (২৪) শয্যা রচনা, (২৫) সূচীকর্ম, (২৬) খেলনা রচনা, (২৭) ভূষণ অর্থাৎ অলংকার রচনা, (২৮) কর্ণপত্র, কর্ণালংকার প্রস্তুতবিধি, (২৯) তণ্ডুল কুসুমাদি দ্বারা পূজোপহার রচনা, (৩০) সম্পাট্য অর্থাৎ হীরা-মণি-রত্নাদি কাটা, (৩১) মণিরত্ন বসানো, (৩২) বাস্তুবিদ্যা, (৩৩) মণিরত্নজ্ঞান, (৩৪) ধাতুরত্নাদি

চলতে চলতে যে শ্রান্ত তার আর শ্রীর অন্ত নেই, হে রোহিত, এই কথাই চিরদিন শুনেছি। যে চলে, দেবতা ইন্দ্রও সখা (comrade) হয়ে তার সঙ্গে সঙ্গে চলেন। যে চলতে চায় না, সে শ্রেষ্ঠ জন হলেও ক্রমে নীচ (পাপ), হতে থাকে অতএব এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো।

পুষ্পিণ্যৌ চরতো জঙ্ঘে ভূষ্ণুরাত্মা ফলগ্রহিঃ।
শেরেঽস্য সর্বে পাপ্মানঃ শ্রমেণ প্রপথে হতাঃ। চরৈবেতি, চরৈবেতি।

যে চলে, দেহের দিক থেকেও তার অপূর্ব শোভা ফুলের মতো প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে, তার আত্মা দিনে-দিনে বিকশিত হতে থাকে, এই তো মস্ত ফল। তার পর তার চলার শ্রমে চলবার মুক্ত পথে তার পাপগুলি আপনিই অবসন্ন হয়ে পড়ে শুয়ে। পাপের সমস্যার জন্য আর তার বৃথা মাথা ঘামাতে হয় না। অতএব এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো।

আস্তে ভগ আসীনস্যোর্ধ্বস্তিষ্ঠতি তিষ্ঠতঃ।
শেতে নিপদ্যমানস্য চরাতি চরতো ভগঃ। চরৈবেতি, চরৈবেতি।

যে বসে থাকে তার ভাগ্যও থাকে বসে, যে উঠে দাঁড়ায় তার ভাগ্যও উঠে দাঁড়ায়, যে শুয়ে পড়ে তার ভাগ্যও পড়ে শুয়ে, যে এগিয়ে চলে, তার ভাগ্যও চলে এগিয়ে। অতএব এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো।

কলিঃ শয়ানো ভবতি সঞ্জিহানস্তু দ্বাপরঃ।
উত্তিষ্ঠংস্ত্রেতা ভবতি কৃতং সংপদ্যতে চরন্। চরৈবেতি, চরৈবেতি।

ঘুমিয়ে থাকাটাই হল কলিকাল, জাগলেই হল দ্বাপর, উঠে দাঁড়ালেই হল ত্রেতা, এগিয়ে চলাই হল সত্য যুগ। অতএব এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো।

চরন্ বৈ মধু বিন্দতি চরন্ স্বাদুমুদুম্বরম্।
সূর্যস্য পশ্য শ্রেমাণং যো ন তন্দ্রয়তে চরন্। চরৈবেতি, চরৈবেতি।

চলাটাই হল অমৃতলাভ, চলাটাই তার স্বাদু ফল, চেয়ে দেখো ঐ সূর্যের আলোকসম্পদ, যে সৃষ্টির আদি হতে চলতে চলতে একদিনের জন্যও ঘুমিয়ে পড়েনি। অতএব এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো।

এর চেয়ে এগিয়ে চলবার দীপ্ততর বাণী কি আর কোথাও শুনেছি। এখনকার দিনের উন্নততম দেশেও এই বাণীগুলিকে মূলমন্ত্র করে নিলে তাঁদের এগিয়ে চলবার সাধনার পক্ষে কোনো লজ্জার কারণ হয় না।

পরিচিত হল। এই 'তৈর্থিক' সভ্যতার মধ্যে অনেক উন্নত ও মহৎ ভাব ছিল, বৈদিক সভ্যতা ক্রমে সেগুলির দ্বারা ঐশ্বর্যময় হয়ে উঠতে লাগল।

বেদের প্রথম দিকে আমরা ইহলোকের কাম্য ধনজন ও পরলোকের কাম্য স্বর্গের কথাই পাই। ধর্মের জন্য যজ্ঞ, যজ্ঞের জন্য জীবহিংসা না করলে চলে না। ক্রমে দেখা গেল বৈদিক আর্যেরা নিষ্কাম ধর্ম অহিংসা প্রভৃতি সব মহা উচ্চ ভাবে ভরপুর হয়ে উঠলেন। নিরামিষ-আহার ভক্তি জন্মান্তরবাদ মায়াবাদ যোগসাধনা বৈরাগ্যসাধনা ভক্তিসাধনা ব্রত উপবাস তীর্থস্থান প্রভৃতি বড়ো বড়ো সব আদর্শ ক্রমে আসতে লাগল। ভক্তি ও প্রেমের কথা বেদে থাকলেও অনেকে মনে করেন, দ্রাবিড় সভ্যতার প্রভাবেই তা ভারতীয় সাধনায় প্রধান স্থান পেয়েছে। এখানকার সবকিছুরই মূলে আর্য ও আর্যপূর্ব সভ্যতার গভীর সংযোগ। প্রধানত এই দুই সভ্যতার সংগমতীর্থেই পরবর্তী কালের পরম ঐশ্বর্যময় হিন্দুধর্ম জন্মলাভ করেছে। যেখানে আর্যপূর্ব উন্নত মতবাদের সঙ্গে তার দেখা হয়েছে সেখানে এই মিলনের ফল খুব সুন্দর হয়েছে, যেমন সকাম স্বর্গের জায়গায় এল ক্রমে নিষ্কাম মুক্তির সাধনা ও কর্মকাণ্ডের স্থানে এল 'ভক্তিবাদ'। আবার কোথাও-কোথাও প্রাকৃত সব মতবাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এল তন্ত্র-মন্ত্র-অভিচার প্রভৃতির শাস্ত্র। মিশবার ফলে ভালো মন্দ দুইই আসতে বাধ্য। অথর্ববেদে প্রাকৃত সংস্কৃতির সঙ্গে বৈদিক সংস্কৃতির একটা সেই রকম গভীর যোগের পরিচয় দেখতে পাওয়া যায়। তার ফলে দেবতার বদলে মানুষের প্রতি ও স্বর্গের বদলে পৃথিবীর প্রতি যে অনুরাগের নমুনা অথর্ববেদে দেখা যায় বৈদিক সাহিত্যেও তা অপূর্ব। অনেক স্থূল ও কুৎসিত বস্তুও ক্রমে উন্নত ও পবিত্র হয়ে উঠেছে এই সংযোগের ফলে।

আর্যেরা নদ নদী বিল সমুদ্রের সঙ্গে বেশি পরিচিত ছিলেন না। তাঁরা এসে যখন নাগ প্রভৃতি অনার্য অথচ সুসভ্য জাতিকে তাড়া দিলেন তখন নাগবংশীয়েরা জলাশয়ের কাছে গিয়ে বাস করতে লাগলেন। মহাভারত প্রভৃতি দেখলে তা বেশ বুঝা যায়। এই নাগকন্যার গর্ভজ জরৎকারু মুনির পুত্র আস্তিক। তিনি ব্রাহ্মণোত্তম ছিলেন। তখন ব্রাহ্মণেরা অনার্য বিবাহ করতেন, সন্তানেরা ব্রাহ্মণই হতেন। মহাভারত পুরাণাদি দেখলে তা বেশ বোঝা যায়। আগে এই সব বিবাহের সন্তান পিতার জাতিই পেতেন। কারণ আর্যদের মধ্যে

প্রধান হল পুরুষ। তাকে বলে বীজপ্রাধান্য। পরে দ্রাবিড়াদি জাতির মাতৃতন্ত্র সমাজের প্রভাবে মায়ের জাতই সন্তানেরা পেতে লাগলেন। তার নাম ক্ষেত্রপ্রাধান্য। তা অনার্য প্রভাবের ফল।

ভীম যখন কৌরবদের বিষে হতচেতন হয়ে জলে ভাসতে ভাসতে নাগদের দেশে গেলেন, সেখানে ভীমকে আত্মীয় বলেই নাগরাজ যত্ন করলেন। ভীমের সঙ্গে তাঁদের রক্তের যোগ ছিল। নাগেরা আর্য না হলেও খুবই সভ্য ছিলেন। জলের সঙ্গে সম্বন্ধ যে-সব জিনিসের আছে তার অনেকই এই অনার্যদের থেকে পাওয়া। জালও জলসম্বন্ধীয়। নৌকা ও নৌকার অনেক কিছু এই সূত্রে এসেছে। মাছ খাওয়াটাও প্রধানত অনার্যদের কাছে শেখা। আর্যেরা বেশির ভাগ মাংসই খেতেন। শাঁখা আর্যেরা জানতেন না, শাঁখা-সিঁদুর প্রভৃতি এয়োর চিহ্ন নাগদের কাছে পাওয়া।

নৃত্যগীতবাদ্যও আর্যরা অনার্যদের থেকেই পেয়েছেন। ব্রাহ্মণের পক্ষে বেদগান ছাড়া শিব বা বিষ্ণুর জন্য নৃত্য-গীত করা নিষিদ্ধ ছিল। শূদ্র ও নারীরাই তা করতে পারতেন। ভাগবতেরা ভক্তির গান সমাজে প্রবেশ করালেন। লিঙ্গপুরাণ প্রভৃতি দেখলে তা বোঝা যায়। তবু সমাজে গীতবাদ্য যাদের জীবিকা তাদের স্থান খুব নীচ ছিল। নাটকেও আর্যরা এদেশে অনেক কিছু ঐশ্বর্য লাভ করেছেন।

সম্মিলনের অপূর্ব ফল

আর্য অনার্য সম্মেলনের ফল যে কী অপূর্ব হতে পারে তার অন্তত একটি দৃষ্টান্ত এখানে না দিয়ে পারিনে। যদিও এ রকম বহু দৃষ্টান্ত আছে কিন্তু একটির বেশি এখানে বলা হবে না, কারণ বেশি বললে হয়তো পাঠকের ধৈর্য না থাকতে পারে। এক ঋষির ব্রাহ্মণী পত্নী ছিলেন, শূদ্রা পত্নীও ছিলেন। তখনকার দিনে যজ্ঞস্থলে বসেই শিক্ষা দেবার চমৎকার সুযোগ মিলত। যজ্ঞ উপস্থিত হল, মায়েরা শিক্ষালাভ করবার জন্য ছেলেদের পাঠিয়ে দিলেন যজ্ঞস্থলে তাদের বাপের কাছে। সেই মহর্ষি আপন ব্রাহ্মণী পত্নীর গর্ভজাত ছেলেকে কোলে বসিয়ে আদর করে শিক্ষা দিলেন কিন্তু শূদ্রা পত্নীর সন্তানকে যজ্ঞস্থলে উপেক্ষা করলেন।

বিচার, (৩৫) খনিবিদ্যা, (৩৬) ধাতুবিদ্যা (শুক্রনীতি মতে যন্ত্রশিল্প), (৩৭) ইন্দ্রজাল, (৩৮) বস্ত্র গোপন, (৩৯) হস্তলাঘব, (৪০) চিত্রযোগ, (৪১) সূত্রক্রিয়া, পুতুলনাচ, (৪২) পশু-পক্ষী লড়ানো, (৪৩) পাখি পড়ানো, (৪৪) দ্যূতবিদ্যা, (৪৫) আকর্ষণ ক্রীড়া, (৪৬) অভিধান বিদ্যা, (৪৭) বৈনয়িকী বিদ্যা, (৪৮) দেশভাষাজ্ঞান, (৪৯) ম্লেচ্ছিতক-বিকল্প, ম্লেচ্ছ ভাষার জ্ঞান, (৫০) কাব্য-সমস্যা পূরণ, (৫১) অক্ষরমুষ্টিকা, অঙ্গুলি দ্বারা অক্ষর রচনা, (৫২) উত্তমরূপে পড়িবার বিদ্যা, (৫৩) নাটকাখ্যানাদি দর্শন, (৫৪) মানসী কাব্য-ক্রিয়া, (৫৫) প্রহেলিকা, (৫৬) যন্ত্রমাতৃকা, (৫৭) উদকঘাত, (৫৮) উৎসাদন, (৫৯) দুর্বাচক যোগ, (৬০) পুষ্পশকটিকা, নিমিত্তজ্ঞান, (৬১) ধারণ-মাতৃকা, (৬২) ক্রিয়াবিকল্প, (৬৩) ছলিতক যোগ, (৬৪) বৈতালিকী বিদ্যা।